বিরুদ্ধ পক্ষের সত্তাকে যথেষ্ট সত্য বলিয়া স্বীকার না করিবার চেষ্টাতেই এবার কন্‌গ্রেস ভাঙিয়াছে।”

[উদ্ধৃত অংশটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর ‘যজ্ঞভঙ্গ’ প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে। (ে-এর ব্যবহার ছাড়া মূল বানান অপরিবর্তিত)]

বাংলায় বঙ্গভঙ্গ-বিরোধ আন্দোলন

বিংশ শতকের প্রথম দশকে বাংলায় বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী স্বদেশি আন্দোলন চরমপন্থার সবথেকে জোরালো নজির ছিল। শেষপর্যন্ত এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই সর্বভারতীয় স্তরে নরমপন্থার বিকল্প হিসেবে চরমপন্থার বাস্তব

রূপটি হাজির হয়েছিল। লর্ড কার্জন প্রস্তাবিত বাংলা বিভাজনের উদ্যোগকে রদ করার জন্যই বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী স্বদেশি আন্দোলন গড়ে তোলা হয়েছিল।

বাংলায় ব্রিটিশ-শাসনের সমালোচক ও বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিগুলিকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যেই কার্জন বাংলা ভাগের পরিকল্পনা করেছিলেন। ঊনবিংশ শতকেই বাংলা প্রেসিডেন্সির ভৌগোলিক সীমানা ছিল বিরাট। ঐ বিরাট অঞ্চলে সুষ্ঠু প্রশাসনিক তদারকি ক্রমেই অসুবিধাজনক ও ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছিল। তার ফলে বাংলা প্রেসিডেন্সির প্রশাসনিক বিভাজন নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে আসামকে স্বতন্ত্র অঞ্চল হিসাবে বাংলা থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে কার্জনের আমলে জনগণনায়

লর্ড কার্জন

দেখা যায় বাংলার জনসংখ্যা ৭ কোটি ৮০ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে। ফলে বাংলা বিভাজনের তড়িঘড়ি উদ্যোগ নেন কার্জন। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জুলাই সরকারিভাবে বাংলা বিভাজনের পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়। সে বছরই ১৬ অক্টোবর ঐ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা হয়। যথার্থই প্রশ্ন ওঠে কেবল প্রশাসনিক সুবিধা অর্জনই কি ব্রিটিশ সরকারের তরফে বাংলা বিভাজনের একমাত্র কারণ ছিল? ঔপনিবেশিক সরকার জোরের সঙ্গেই প্রশাসনিক সুবিধার যুক্তি পেশ করেছিল। কিন্তু ধর্মভিত্তিক অঞ্চল বিভাজনের ভিতরে জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব ঔপনিবেশিক সরকারের

ভেদনীতিকেই দায়ী করেছিলেন। বস্তুত, ঐক্যবদ্ধ বাংলা ও বাঙালিদের রাজনৈতিক বিরোধিতার সম্ভাবনা দুর্বল করে দেওয়ার জন্যেই বাংলা বিভাজন করা হয়েছিল বলে মনে করা হয়। উচ্চবর্ণের হিন্দু বাঙালি ভদ্রলোকদের পাশাপাশি অন্যান্য মানুষকে শিক্ষা ও জীবিকার সুযোগ দেওয়ার যুক্তি দেখিয়েছিল ঔপনিবেশিক প্রশাসন।

আদতে অবশ্য বাংলা ভাগের উদ্যোগ ব্রিটিশ সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোয়নি। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন বাঙালি সম্প্রদায় ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। ১৮৯০-এর দশকে বাংলায় দুর্ভিক্ষ ও মড়কের ফলে অর্থনৈতিক দুরবস্থা চূড়ান্ত হয়েছিল। তার ফলে দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিসপত্রের দাম

বাড়তে থাকে । ফলে বিরাট সংখ্যক মধ্যবিত্ত জনগণের পক্ষে দিন গুজরান কঠিন হয়ে পড়েছিল। সেই পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সরকারের তরফে বাংলা বিভাজনের উদ্যোগ চূড়ান্ত বিক্ষোভ উশকে দিয়েছিল। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বঙ্গভঙ্গ রদ করার আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। দ্রুতই সেই আন্দোলন রাজনৈতিক ও সামাজিক বিভিন্ন বিষয়কেও অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন ক্রমেই হয়ে উঠেছিল স্বদেশি আন্দোলন।

টুকরো কথা

স্বদেশি যুগ: অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চোখে

"ভূমিকম্পের বছর সেটা, নাটোর গেলুম সবাই মিলে, প্রোভিন্সিয়াল কন্‌ফারেন্স হবে। ....

সেখানে রবিকাকা প্রস্তাব করলেন, প্রোভিন্সিয়াল কন্‌ফারেন্স বাংলা ভাষায় হবে— বুঝবে সবাই। আমরা ছোকরারা ছিলুম রবিকাকার দলে। বললুম, হ্যাঁ, এটা হওয়া চাই যে করে হোক।.... চাঁইরা বললেন, যেমন কংগ্রেসে হয় সব বক্তৃতা-টক্তৃতা ইংরেজিতে তেমনিই হবে প্রোভিন্সিয়াল কন্‌ফারেন্সে। প্যাণ্ডেলে গেলুম, এখন যে'ই বক্তৃতা দিতে উঠে দাঁড়ায় আমরা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠি, বাংলা, বাংলা। কাউকে আর মুখ খুলতে দিই না। ইংরেজিতে মুখ খুললেই 'বাংলা' 'বাংলা' বলে চেঁচাই। শেষটায় চাঁইদের মধ্যে অনেকেই বাগ মানলেন।.... যাক, আমাদের তো জয়জয়কার। বাংলা ভাষার প্রচলন হল কন্‌ফারেন্সে। সেই প্রথম আমরা বাংলা ভাষার জন্য লড়লুম।....

আমি আঁকলুম ভারতমাতার ছবি। ..... রবিকাকা গান তৈরি করলেন, দিনুর উপর ভার পড়ল, সে দলবল নিয়ে সেই পতাকা ঘাড়ে করে সেই গান গেয়ে গেয়ে চোরবাগান ঘুরে চাঁদা তুলে নিয়ে এল। তখন সব স্বদেশের কাজ স্বদেশী ভাব এই ছাড়া আর কথা নেই। নিজেদের সাজসজ্জাও বদলে ফেললুম।....

ভারতমাতা

.....

তখনকার সেই স্বদেশী যুগে ঘরে চরকা কাটা, তাঁত বোনা, ...। মনে পড়ে এই বাগানেই সুতো রোদে দেওয়া হত। ছোটো ছোটো গামছা ধুতি তৈরি করে

মা আমাদের দিলেন--- সেই ছোটো ধুতি, হাঁটুর উপর উঠে যাচ্ছে, তাই প'রে আমাদের উৎসাহ কত।

.....

রবিকাকা একদিন বললেন, রাখীবন্ধন-উৎসব করতে হবে আমাদের, সবার হাতে রাখী পরাতে হবে। ..... ঠিক হল সকালবেলা সবাই গঙ্গায় স্নান করে সবার হাতে রাখী পরাব। এই সামনেই জগন্নাথ ঘাট, সেখানে যাব--- রবিকাকা বললেন, সবাই হেঁটে যাব, গাড়িঘোড়া নয়। ..... রওনা হলুম সবাই গঙ্গাস্নানের উদ্দেশ্যে, রাস্তার দুধারে বাড়ির ছাদ থেকে আরম্ভ করে ফুটপাথ অবধি লোক দাঁড়িয়ে গেছে--- মেয়েরা খৈ ছড়াচ্ছে, শাঁক বাজাচ্ছে, মহা ধুমধাম--- যেন একটা

শোভাযাত্রা। দিনুও ছিল সঙেগ, গান গাইতে গাইতে রাস্তা দিয়ে মিছিল চলল--- বাংলার মাটি, বাংলার জল,/বাংলার বায়ু, বাংলার ফল---/পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।।

এই গানটি সে সময়েই তৈরি হয়েছিল। ঘাটে সকাল থেকে লোকে লোকারণ্য, রবিকাকাকে দেখবার জন্য আমাদের চার দিকে ভিড় জমে গেল। স্নান সারা হল--- সঙেগ নেওয়া হয়েছিল একগাদা রাখী, সবাই এ ওর হাতে রাখী পরালুম। অন্যরা যারা কাছাকাছি ছিল তাদেরও রাখী পরানো হল। হাতের কাছে ছেলেমেয়ে যাকে পাওয়া যাচ্ছে, কেউ বাদ পড়ছে না, সবাইকে রাখী পরানো হচ্ছে।

গঙগার ঘাটে সে এক ব্যাপার। ..... হঠাৎ রবিকাকার খেয়াল গেল চিৎপুরের বড়ো মসজিদে গিয়ে সবাইকে রাখী পরাবেন। হুকুম হল, চলো সব।....

.....

বেশ চলছিল আমাদের কাজ। মনে হচ্ছিল এবারে যেন একটা ইন্‌ডাস্ট্রিয়াল রিভাইভাল হবে দেশে। দেশের লোক দেশের জন্য ভাবতে শুরু করেছে, সবার মনেই একটা তাগিদ এসেছে, দেশকে নতুন একটা কিছু দিতে হবে। এমন সময়ে সব মাটি হল যখন একদল নেতা বললেন, বিলিতি জিনিস বয়কট করো। দোকানে দোকানে তাদের চেলাদের দিয়ে ধন্না দেওয়ালেন, যেন কেউ না গিয়ে বিলিতি জিনিস কিনতে পারে।

রবিকাকা বললেন, এ কী, যার ইচ্ছে হয় বিলিতি জিনিস ব্যবহার করবে, যার ইচ্ছে হয় করবে না। আমাদের কাজ ছিল লোকের মনে আস্তে আস্তে বিশ্বাস ঢুকিয়ে দেওয়া — জোর জবরদস্তি করা নয়। ..... বিলিতি বর্জন শুরু হল, বিলিতি কাপড় পোড়ানো হতে লাগল, পুলিশও ক্রমে নিজমূর্তি ধরল। টাউন হলে পাবলিক মিটিঙে যেদিন সুরেন বাঁড়ুজ্জে বয়কট ডিক্লেয়ার করলেন রবিকাকা তখন থেকেই স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলেন, তিনি এর মধ্যে নেই।

গেল আমাদের স্বদেশী যুগ ভেঙে। কিন্তু এই যে স্বদেশী যুগে ভাবতে শিখেছিলুম, দেশের জন্য নিজস্ব কিছু দিতে হবে, সেই ভাবটিই ফুটে বের হল আমার ছবির জগতে।”

[উদ্ধৃত অংশটি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর ঘরোয়া রচনা থেকে নেওয়া হয়েছে। (ে-এর ব্যবহার ছাড়া মূল বানান অপরিবর্তিত)]

টুকরো কথা

স্বদেশি শিল্প

বয়কট ও স্বদেশি আন্দোলন তাঁত, রেশম ও আরো কতগুলি দেশীয় শিল্পকে নতুন করে উৎসাহ জুগিয়েছিল। বিদেশি বা দেশি বড়ো কল-কারখানায় তৈরি জিনিসপত্রের বদলে দেশীয় ছোটো ছোটো শিল্পের উদ্যোগ শুরু হয় বাংলায়। ছাত্রদের কারিগরি শিক্ষা নেওয়ার জন্য জাপান প্রভৃতি দেশে পাঠানোর জন্য তহবিল গড়ে তোলা হয়। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে

চালু হয় বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস। চিনা মাটির পাত্র, সাবান, দেশলাই প্রভৃতির দেশীয় কল-কারখানা তৈরি হয়। তবে মূলধনের অভাবে স্বদেশি শিল্প বিশেষ সাফল্য পায়নি। তবে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়-এর বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস এর ব্যতিক্রম।

নিজে করো

স্বাধীনতা সংগ্রাম ও নানা বিদ্রোহ নিয়ে লেখা বেশ কিছু গল্প, কবিতা ও গান সংগ্রহ করো। তোমার সংগ্রহের লেখাগুলির সঙ্গে কোন ধরনের আন্দোলন-বিদ্রোহের মিল আছে তা খুঁজে বের করো।

বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী স্বদেশি আন্দোলন প্রকৃত গণআন্দোলন হিসেবে গড়ে উঠতে ব্যর্থ হয়েছিল। কারণ আন্দোলনের অধিকাংশ নেতাই ছিলেন বড়ো শহর বা মফস্সলের শিক্ষিত ভদ্রলোক গোষ্ঠীর মানুষ। ফলে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিকভাবে অধিকাংশ জনগণের উপযোগী কোনো কর্মসূচি হাজির করতে স্বদেশি নেতৃত্ব ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাছাড়া স্বদেশি জিনিস ব্যবহারের জন্য অনেকক্ষেত্রে সাধারণ গরিব মানুষের উপর জোরজুলুম করা হতো। অথচ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিদেশি দ্রব্যের তুলনায় স্বদেশি দ্রব্যের দাম অনেক বেশি হতো।

সেইসব দ্রব্য কেনার ক্ষমতা উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের থাকলেও, বেশিরভাগ গরিব জনগণের ঐ ক্রয় ক্ষমতা ছিল না। প্রয়োজনের তুলনায় স্বদেশি দ্রব্যের জোগানও ছিল খুবই কম। একই কথা স্বদেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও আদালতের ক্ষেত্রেও খাটে। পাশাপাশি স্বদেশি নেতৃত্ব যখন শ্রমিক ধর্মঘট আয়োজন করতেন তখন তার থেকে হিন্দুস্তানি শ্রমিক ও বাগিচা শ্রমিকেরা বাদ পড়ে যেত। ফলে দরিদ্র কৃষক, শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ চরমপন্থীদের নেতৃত্বে স্বদেশি আন্দোলনে শামিল হতে পারেননি। তাছাড়া বেশ কিছু

চরমপন্থী নেতা স্বদেশি আন্দোলনে ধর্মীয় প্রতীক ও দেবদেবীর প্রসঙ্গ ব্যবহার করতে থাকেন। সেইসব প্রসঙ্গে হিন্দু ধর্মীয় ঝোঁক ক্রমেই বেড়ে ওঠে। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান ও বৈষ্ণব কৃষকেরা চরমপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে মানসিকভাবে যুক্ত হতে পারেনি।

টুকরো কথা

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ: রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ

‘‘আজ আমরা সকলেই এই কথা বলিয়া আক্ষেপ করিতেছি যে, ইংরেজ মুসলমানদিগকে গোপনে হিন্দুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া দিতেছে। কথাটা যদি সত্যই হয় তবে ইংরেজের বিরুদ্ধে রাগ করিব কেন।

দেশের মধ্যে যতগুলি সুযোগ আছে ইংরেজ তাহা নিজের দিকে টানিবে না, ইংরেজকে আমরা এতবড়ো নির্বোধ বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিব এমন কী কারণ ঘটিয়াছে।

মুসলমানকে যে হিন্দুর বিরুদ্ধে লাগানো যাইতে পারে এই তথ্যটাই ভাবিয়া দেখিবার বিষয়, কে লাগাইল সেটা তত গুরুতর বিষয় নয়।....

.....

আমরা বহুশত বৎসর পাশে পাশে থাকিয়া এক খেতের ফল, এক নদীর জল, এক সূর্যের আলোক ভোগ করিয়া আসিয়াছি ; আমরা এক ভাষায় কথা কই, আমরা একই সুখদুঃখে মানুষ; তবু প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর যে

সম্বন্ধ মনুষ্যোচিত, যাহা ধর্মবিহিত, তাহা আমাদের মধ্যে হয় নাই।....

আমরা জানি, বাংলাদেশের অনেক স্থানে এক ফরাশে হিন্দু-মুসলমানে বসে না---ঘরে মুসলমান আসিলে জাজিমের এক অংশ তুলিয়া দেওয়া হয়, হুঁকার জল ফেলিয়া দেওয়া হয়। তর্ক করিবার বেলায় বলিয়া থাকি, কী করা যায়, শাস্ত্র তো মানিতে হইবে। অথচ শাস্ত্রে হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধে পরস্পরকে এমন করিয়া ঘৃণা করিবার তো কোনো বিধান দেখি না। যদি-বা শাস্ত্রের সেই বিধানই হয় তবে সে শাস্ত্র লইয়া স্বদেশ-স্বজাতি-স্বরাজের প্রতিষ্ঠা কোনোদিন হইবে না।....

.....

যাহা হউক 'বয়কট'-যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া আমরা বাহির হইলাম এবং দেশধর্ম গুরুর নিকট হইতে স্বরাজমন্ত্রও গ্রহণ করিলাম; মনে করিলাম এই সংগ্রাম ও সাধনার যত-কিছু বাধা সমস্তই বাহিরে, আমাদের নিজেদের মধ্যে আশঙ্কার কারণ কিছুই নাই। এমন সময় হঠাৎ আমাদের ভিতরকার বিচ্ছিন্ন অবস্থা বিধাতা এমন সুকঠোর সুস্পষ্ট আকারে দেখাইয়া দিলেন যে, আমাদের চমক লাগিয়া গেল। ....

ইংরেজ সমস্ত ভারতবর্ষের কাঁধের উপরে এমন করিয়া যে চাপিয়া বসিয়াছে, সে কি কেবল নিজের জোরে। ..... লক্ষণের দ্বারা ব্যাধির পরিচয় পাইয়া ঠিকমত প্রতিকার করিতে না পারিলে গায়ের জোরে অথবা

বন্দেমাতরম্ মন্ত্র পড়িয়া সন্নিপাতের হাত এড়াইবার কোনো সহজ পথ নাই।

বিদেশী রাজা চলিয়া গেলেই দেশ যে আমাদের স্বদেশ হইয়া উঠিবে তাহা নহে। দেশকে আপন চেষ্টায় আপন দেশ করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয়। অন্নবস্ত্র-সুখস্বাস্থ্য-শিক্ষাদীক্ষা দানে দেশের লোকই দেশের লোকের সর্বপ্রধান সহায়, দুঃখে বিপদে দেশের লোকই দেশের জন্য প্রাণপণ করিয়া থাকে, ইহা যেখানকার জনসাধারণে প্রত্যক্ষভাবে জানে সেখানে স্বদেশ যে কী তাহা বুঝাইবার জন্য এত বকাবকি করিতে হয় না। আজ আমাদের ইংরেজি-পড়া শহরের লোক যখন নিরক্ষর গ্রামের লোকের কাছে গিয়া বলে 'আমরা উভয়ে ভাই' --- তখন এই ভাই কথাটার মানে সে বেচারা কিছুই বুঝিতে পারে না। .....

কোনো বিখ্যাত 'স্বদেশী'-প্রচারকের নিকট শুনিয়াছি যে, পূর্ববঙ্গে মুসলমান শ্রোতারা তাঁহাদের বক্তৃতা শুনিয়া পরস্পর বলাবলি করিয়াছে যে, বাবুরা বোধ করি বিপদে ঠেকিয়াছে। ইহাতে তাঁহারা বিরক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু চাষা ঠিক বুঝিয়াছিল। বাবুদের স্নেহভাষণের মধ্যে ঠিক সুরটা যে লাগে না তাহা তাহাদের বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। উদ্দেশ্যসাধনের উপলক্ষে প্রেমের সম্বন্ধ পাতাইতে গেলে ক্ষুদ্রব্যক্তির কাছেও তাহা বিস্বাদ বোধ হয়— সে উদ্দেশ্য খুব বড়ো হইতে পারে, হউক তাহার নাম 'বয়কট' বা 'স্বরাজ', দেশের উন্নতি বা আর কিছু। মানুষ বলিয়া শ্রদ্ধাবশত ও স্বদেশী বলিয়া স্নেহবশত আমরা যদি সহজেই দেশের জনসাধারণকে

ভালোবাসিতাম, ইংরেজি শিক্ষায় আমাদের পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ না ঘটাইয়া মিলনকে যদি দৃঢ় করিতে পারিত, তাহাদের মাঝখানে থাকিয়া তাহাদের আপন হইয়া তাহাদের সর্বপ্রকার হিতসাধনে যদি আমাদের উপেক্ষা বা আলস্য না থাকিত, তবে আজ বিপদ বা ক্ষতির মুখে তাহাদিগকে ডাক পাড়িলে সেটা অসংগত শুনিতে হইত না।”

[উদ্ধৃত অংশটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর ‘ব্যাধি ও প্রতিকার’ প্রবন্ধ থেকে নেওয়া। (ে-এর ব্যবহার ছাড়া মূল বানান অপরিবর্তিত)]

টুকরো কথা

জাতীয় শিক্ষা

স্বদেশি আন্দোলনের ফলে ইংরাজি ভাষা ও ইংরেজি শিক্ষা তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি বিরাগ তৈরি হয়। মাতৃভাষায় সমস্ত বিষয়ে পঠনপাঠনের চর্চার উদ্যোগ শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতন এই উদ্যোগের একটি উদাহরণ। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে তৈরি হয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (ন্যাশনাল কাউন্সিল অভ এডুকেশন)। বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ, বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট ও বেশ কয়েকটি জাতীয় বিদ্যালয় তৈরি হয়। অনেক ছাত্রই জাতীয় বিদ্যালয়গুলিতে ভর্তি হতো। পূর্ববঙ্গের কয়েকটি জাতীয় বিদ্যালয় খুবই বিখ্যাত ছিল।

সেইসব বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা বিপ্লবী আন্দোলনের কর্মী হিসাবেও কাজ করত। ঢাকার কাছে সোনারঙ জাতীয় বিদ্যালয়ের নাম এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তবে টাকার বরাদ্দ কম থাকার জন্য জাতীয় শিক্ষার বিস্তার থমকে যায়।

বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ

সতীশচন্দ্র বসু

স্বদেশি আন্দোলনের শেষ দিকে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী ধারাটি বেশি করে দেখতে পাওয়া যায়। এই ধারার একটি প্রধান ভিত্তি ছিল বিভিন্ন সমিতিগুলি। আপাতভাবে সমিতিগুলি শরীরচর্চার পাশাপাশি বিভিন্ন সমাজসেবামূলক উদ্যোগ

নিত। তার মধ্যে দিয়ে মূলত ছাত্র ও যুবসমাজের কাছে স্বদেশির ভাবধারা প্রচার করা হতো। সেই সময়ে মূলত বিভিন্ন সমিতিকে কেন্দ্র করে বিপ্লবী পন্থায় ব্রিটিশ প্রশাসনের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করার ধারাটি গড়ে ওঠে। একদিকে জাতীয় কংগ্রেসের 'আবেদন-নিবেদন' নীতির অসারতা স্পষ্ট হচ্ছিল। অন্যদিকে, স্বদেশি আন্দোলনের ফলে বেড়ে চলেছিল ঔপনিবেশিক দমন-পীড়ন। পাশাপাশি, ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ স্বদেশি আন্দোলন সামাজিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সেই পরিস্থিতিতে বিপ্লবীদের অনেকেই ঔপনিবেশিক প্রশাসনকে সন্ত্রস্ত করে ধাক্কা দিতে চেয়েছিলেন। তার ফলে

বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী ধারাটি ক্রমে প্রবল হয়ে ওঠে।

অত্যাচারী ব্রিটিশ প্রশাসক ও তাদের সহযোগী দেশীয় ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে শুরু করেন বিপ্লবীরা। তাদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত সন্ত্রাসের পথ বেছে নেওয়া হতে থাকে। তবে অসাবধানতাজনিত দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া নির্বিচার সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালানো বিপ্লবীদের লক্ষ্য ছিলনা। বাস্তবত সেই সময়ে জনগণের সামনে উপনিবেশ-বিরোধী আন্দোলনের কোনো কর্মসূচি ছিল না। ফলে, ঔপনিবেশিক দমন-পীড়নের পালটা সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ শাসককুলে ত্রাস সৃষ্টি করা অপরিহার্য মনে করেছিলেন

অনেকেই। যদিও বিপ্লবীদের সামনে সেটাই একমাত্র পথ ছিলনা। সবাই নির্বিচারে সেই পথকে সমানভাবে সমর্থনও করেননি।

রাজনৈতিক প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের মাধ্যম হিসেবে হিংসার ব্যবহার ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহেও লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ১৮৭৬-'৭৭ খ্রিস্টাব্দে মহারাষ্ট্রে বাসুদেও বলবন্ত ফাদকে সাধারণ মানুষদের নিয়ে একটি সংগঠন তৈরি করেন। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় ছিল টাকা। সেই টাকা জোগাড় করার জন্যই ফাদকে তাঁর দলকে ডাকাতি করতে পাঠান। তবে শেষে অবধি ফাদকে ধরা পড়েন ও তাঁর সশস্ত্র বিদ্রোহের

অনুশীলন সমিতির প্রতীক

পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়। এরপর বিভিন্ন সমিতি ও আখড়ার মাধ্যমে মহারাষ্ট্রে বিপ্লবী কার্যকলাপ চালানো হতে থাকে। বাংলাতেও শরীরচর্চার প্রতিষ্ঠানগুলিকে কেন্দ্র করেই বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ সংগঠিত হতে শুরু করে। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় তিনটি ও মেদিনীপুরে একটি দল তৈরি হয়। এগুলির মধ্যে সতীশচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত অনুশীলন সমিতি অন্যতম বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান। অবশ্য এই সমিতিগুলির বিপ্লবী কার্যকলাপ গোপনে চালানো হতো।

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন)

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সময় থেকেই বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন নতুন সমিতি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে পুলিনবিহারী দাসের নেতৃত্বে ঢাকা অনুশীলন সমিতি তৈরি হয়। সারা বাংলাব্যাপী বিপ্লবীদের সম্মেলন আয়োজন করা হয়। যুগান্তর পত্রিকা হয়ে ওঠে বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলনের মুখপত্র। অর্থ জোগাড় করার জন্য স্বদেশি ডাকাতির পাশাপাশি বোমা বানানোর উদ্যোগও নেওয়া হতে থাকে। কলকাতার মানিকতলায় বোমা তৈরির

কারখানা বানানো হয়। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ৩০এপ্রিল ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকি বাংলার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে মারার উদ্যোগ নেন।

কিংসফোর্ডকে মারার উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ার পর সরকারের তরফে বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি চূড়ান্ত দমন-পীড়ন চালানো হয়। মানিকতলার বোমা কারখানাটির হদিস পেয়ে যায় ব্রিটিশ প্রশাসন। বিভিন্ন বিপ্লবী নেতৃত্বকে গ্রেফতার করে মৃত্যুদণ্ড অথবা কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

উপনিবেশ-বিরোধী আন্দোলন এবং চূড়ান্ত স্বাধীনতা অর্জনের নিরিখে বিচার করলে প্রথম পর্বের বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ খুব একটা সফল হয়নি। নানান কারণে তাঁদের অধিকাংশ

কর্মসূচি হয় ধরা পড়ে গিয়েছিল, অথবা ব্যর্থ হয়েছিল। তাছাড়া প্রয়োজনের কারণে তাঁদের কাজকর্ম গুপ্ত হওয়ার ফলে বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলনের কর্মসূচি হাজির করতে পারেনি বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ। কিন্তু তাঁদের কাজকর্ম জানাজানি হয়ে যাওয়ার পর সমাজে তার প্রভাব পড়ত। ব্যক্তিগত স্তরে বিপ্লবীদের আদর্শ ও সাহস অনেক ক্ষেত্রেই অনুপ্রেরণার বিষয় হয়েছিল। তবে সশস্ত্র বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদকে নরমপন্থী 'ভিক্ষাবৃত্তি'-র থেকে ভালো মনে করলেও সবাই সেই পথে চলতে চাননি। অবশ্য ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে মর্লে-মিন্টো সংস্কার প্রস্তাবকে অনেকেই বৈপ্লবিক কাজকর্মের ফলাফল হিসেবে ভেবেছিলেন।

টুকরো কথা

মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন

উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে ভারতীয়রা প্রতিনিধিমূলক স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানাতে শুরু করে। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সময় চরমপন্থীদের কাজকর্ম ব্রিটিশ সরকারকে চিন্তায় ফেলেছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বাংলা ও মহারাষ্ট্রে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের বড়োলাট আর্ল অভ মিন্টো এবং ভারতসচিব জন মর্লে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট পাস করেন। এই আইনে বড়োলাটের কার্যনির্বাহক পরিষদে ও প্রাদেশিক আইনপরিষদে সদস্যসংখ্যা বাড়ানো হয় এবং

ভারতীয়দের প্রতি উদার মনোভাব দেখানো হয়। এর মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার চরমপন্থীদের বিপরীতে নরমপন্থীদের কাছে টেনে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে দুর্বল করতে চেয়েছিল। অন্যদিকে মুসলমানদের পৃথকভাবে সদস্য নির্বাচনের অধিকার দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার সমস্যাকেও উশকে দেওয়া হয়েছিল।

টুকরো কথা

কিংসফোর্ড-হত্যার চেষ্টা

বিচারক কিংসফোর্ডকে মারার জন্য বেশ কিছু সময় ধরেই পরিকল্পনা করেছিলেন বাংলার বিপ্লবীরা। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ৩০ এপ্রিল

মজফফরপুরে কিংসফোর্ডের ফিটনগাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়েন ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকি। কিন্তু রাতের অন্ধকারে তাঁরা খেয়াল করেন নি যে গাড়িটা কিংসফোর্ডের হলেও তাতে তিনি ছিলেন না। তার বদলে মিসেস ও মিস কেনেডি ঐ গাড়িতে ছিলেন।

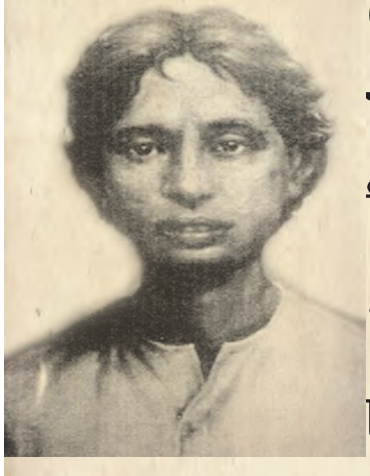

ক্ষুদিরাম বসু

বোমার আঘাতে কেনেডিরা মারা যান। পরদিন ক্ষুদিরাম রিভলবার সমেত ধরা পড়েন। পুলিশের হাত এড়াতে প্রফুল্ল চাকি নিজে নিজেকে গুলি করেন। আদালতের আদেশে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। ক্ষুদিরামের স্মরণে গান বাঁধা হয় : একবার বিদায় দে মা, ঘুরে আসি।

১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়। ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। অবশ্য বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ায় বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যায়নি। বরং পঞ্জাব ও যুক্ত প্রদেশে বিপ্লবী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। উত্তর ভারতের গদর দলের উদ্যোগে বিপ্লবী কার্যকলাপ চলতে থাকে। বাংলায় যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) জর্মানি থেকে অস্ত্র আনিয়ে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পরিকল্পনা করেছিলেন। যদিও বাঘা যতীনের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছিল।

ভেবে দেখো খুঁজে দেখো

১। ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

ক) জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভা বসেছিল— (বোম্বাইতে/গোয়ায়/মাদ্রাজে)।

খ) নরমপন্থীদের দাবি ছিল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার বয়স করতে হবে— (২১/২৩/২০) বছর।

গ) বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা করেছিলেন--- (ডাফরিন/কার্জন/মিন্টো)।

ঘ) বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিল--- (যুগান্তর/হিন্দু প্যাট্রিয়ট/সোমপ্রকাশ) পত্রিকা।

২। নীচের বিবৃতিগুলির কোনটি ঠিক কোনটি ভুল বেছে নাও :

ক) কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ছিলেন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

খ) নরমপন্থীরা চরমপন্থীদের কার্যকলাপকে 'তিনদিনের তামাশা' বলতেন।

গ) অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ।

ঘ) ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকি কিংসফোর্ডকে মারতে গিয়েছিলেন।

৩। অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও (৩০-৪০ টি শব্দ) :

ক) সভাসমিতির যুগ কাকে বলে?

খ) কংগ্রেসের নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যেকার দুটি মূল পার্থক্য উল্লেখ করো।

গ) ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশনের গুরুত্ব উল্লেখ করো?

ঘ) বিংশ শতকের প্রথমদিকে বাংলায় বিভিন্ন গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠেছিল কেন?

৪। নিজের ভাষায় লেখো (১২০-১৬০ টি শব্দ) :

ক) জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে হিউমের ভূমিকার সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করো। তোমার কী মনে হয় হিউম না থাকলেও জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হতো? তোমার বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি দাও।

খ) অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের মূল বক্তব্য কী ছিল? ঐ বক্তব্যের সঙ্গে বয়কট ও স্বদেশি আন্দোলনের কোনো যোগ তুমি খুঁজে পাও কী? যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করো।

গ) চরমপন্থী আন্দোলনের মূল বক্তব্য কী ছিল? তাঁদের আন্দোলনে ধর্মীয় প্রতীকের ব্যবহারকে কী তুমি সমর্থন করো? তোমার বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি দাও।

ঘ) বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের পটভূমি কীভাবে তৈরি হয়েছিল? কেন বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদীদের অনেক উদ্যোগই ব্যর্থ হয়েছিল বলে তোমার মনে হয়?

৫। কল্পনা করে লেখো (২০০ শব্দের মধ্যে) :

ক) ধরা যাক তুমি একজন চরমপন্থী নেতা। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে তোমায় আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে। জনগণের কাছে তোমার বক্তব্য তুলে ধরে একটি বক্তৃতার খসড়া তৈরি করো।

খ) মনে করো তুমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে স্বদেশি আন্দোলনে যোগ দিয়েছ। রাখি বন্ধনের দিনে তোমার অভিজ্ঞতা জানিয়ে বন্ধুকে একটা চিঠি লেখো।

৭ ভারতের জাতীয় আন্দোলনের আদর্শ ও বিবর্তন

ভারতে উপনিবেশ-বিরোধী ও স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ ও তার পরবর্তী সময়ে এক নতুন পর্যায়ে পৌঁছেছিল। এই সময় মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধির নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস পরিচালিত আন্দোলনগুলি ক্রমে গণআন্দোলনে পরিণত হতে থাকে। পাশাপাশি অবশ্য কৃষক, শ্রমিক আন্দোলন- গুলিও চলেছিল। আর বামপন্থী ভাবনায় বিশ্বাসী রাজনৈতিক কর্মী ও সংগঠনগুলিও উপনিবেশ-বিরোধী সংগ্রামে অংশ নিয়েছিল। কিন্তু ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধিই ছিলেন ভারতের ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামের প্রধানতম নেতৃত্ব।

বিংশ শতকের প্রথমভাগে ভারতের উপনিবেশ-বিরোধী আন্দোলনের পাশাপাশি দুটি বিশ্বযুদ্ধ ঘটেছিল। তার মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৯ খ্রি:) চলাকালীন মহাত্মা গান্ধি ভারতে ফিরে আসেন। ভারতের সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব পড়েছিল।

টুকরো কথা

ভারতের উপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব

এশিয়া ও ইউরোপের ছোটোবড়ো অনেক দেশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে গিয়েছিল। ভারতও এর ব্যতিক্রম ছিল না।

ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি মেনে নিয়ে নরমপন্থীরা যুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছিল। বহু ভারতীয় সৈন্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রাণ হারায়। সামরিক খাতে খরচ বেড়ে গিয়েছিল। যার ফলে দরকারি জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায়। সেই সময়ে খাদ্যশস্য উৎপাদনও কমে গিয়েছিল। ১৯১৮- ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে দুর্ভিক্ষ ও সংক্রামক ব্যাধির কারণে কয়েক লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিল।

ভারতে শ্রমিক আন্দোলন আগের তুলনায় অনেক সংগঠিত হতে থাকে। অর্থনৈতিক সংকট সামাজিক জীবনেও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল। ব্রিটিশ-শাসনের প্রতি ভারতীয়দের মোহভঙ্গ হয়েছিল।

মহাত্মা গান্ধি : অহিংস সত্যাগ্রহ ও স্বরাজ ভাবনা

গান্ধির আন্দোলন সংগঠিত করার মধ্যে কতগুলি নতুন ভাবনা ও পরিকল্পনার ছাপ দেখা গিয়েছিল। কয়েকটি আদর্শগত ভাবনাও গান্ধিবাদী আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ছিল। ভারতবর্ষে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার আগে দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধি বর্ণ-বৈষম্য-বিরোধী একটি আন্দোলন চালিয়েছিলেন। সেই আন্দোলন থেকেই ধীরে ধীরে গান্ধিবাদী 'সত্যাগ্রহ'-র ধারণা তৈরি হয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় বিভিন্ন ধর্ম-ভাষা-অঞ্চলের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে লড়াই করেছিলেন গান্ধি। সেই

আন্দোলন প্রচার পাওয়ার ফলে গান্ধি বিখ্যাত হয়ে পড়েছিলেন। সেইসময় ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতারা মূলত এক একটি অঞ্চলের নেতা ছিলেন। কিন্তু, দক্ষিণ আফ্রিকার আন্দোলনের সুবাদে গোড়া থেকেই গান্ধির কোনো বিশেষ আঞ্চলিক ভাবমূর্তি তৈরি হয়নি।

দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণ-বৈষম্য- বিরোধী আন্দোলনে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি ও তাঁর অন্যান্য সহযোগী।

গান্ধির ‘সত্যাগ্রহ’ ও ‘অহিংসা’র আদর্শদুটি পরস্পর সম্পর্কিত। এইদুটিকে একসঙেগ ‘অহিংসা সত্যাগ্রহ’ও বলা হয়। গান্ধি মনে করতেন সত্যের খোঁজ করাই মানবজীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। ফলে সত্যের প্রতি আগ্রহ বা সত্যের প্রতি নিষ্ঠা রাজনৈতিক আন্দোলনেরও চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। পাশাপাশি হিংস্র পথে রাজনৈতিক প্রতিবাদ-প্রতিরোধের পন্থাকেও গান্ধি সমালোচনা করেন। গান্ধির আন্দোলনের চরিত্র একদিকে ছিল গণমুখী। অর্থাৎ, অধিকাংশ জনগণকে আন্দোলনে টেনে আনার মাধ্যমেই অহিংস-সত্যাগ্রহ সফল

হবে। কিন্তু, তার পাশাপাশি, অহিংস-ও সত্যাগ্রহের আদর্শ জনগণকে কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে বলে গান্ধি মনে করতেন। যদিও, গান্ধির পরিচালিত আন্দোলনগুলিতে সবসময়ে অহিংসার আদর্শ পুরোপুরি বজায় থাকেনি। স্বাভাবিকভাবেই তা নিয়ে বিব্রত গান্ধি হিংসাত্মক হয়ে পড়ার ফলে আন্দোলন রদ করার নজিরও রেখেছিলেন।

টুকরো কথা

মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের যে সব অধিকার দেবে বলে ঘোষণা করেছিল, তার কোনোটাই বাস্তবায়িত

হয়নি। সেই পরিস্থিতিতে ভারতে স্বশাসনের আন্দোলন বা Home Rule Movement জোরদার হয়ে উঠেছিল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ভারত-সচিব মন্টেগু এবং লর্ড চেমসফোর্ড ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে ভারত শাসন আইন পাশ করেন। এই আইনে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষমতা ও দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়। যদিও ঐ সংস্কারগুলি ভারতীয়দের সন্তুষ্ট করতে পারেনি। কারণ ভারতীয়দের স্বশাসনের দাবিকে মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারে মানা হয়নি।

টুকরো কথা

গান্ধির স্বরাজ ভাবনা

১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হিন্দ স্বরাজ নামের একটি রচনায় গান্ধি তাঁর স্বরাজ বিষয়ক সামাজিক আদর্শগুলিকে স্পষ্ট করে বিশ্লেষণ করেছিলেন। ঐ আলোচনায় গান্ধি বলেন যে, কেবল ঔপনিবেশিক শাসন বা ব্রিটিশ সরকার নয়, পুরো পাশ্চাত্য আদর্শভিত্তিক আধুনিক শিল্পসমাজই ভারতের সাধারণ মানুষের শত্রু। গান্ধির মতে, কেবল রাজনৈতিকভাবে স্বরাজের দাবি অর্ধেক স্বাধীনতার দাবি। কারণ, তার ফলে ব্যক্তিগতভাবে ব্রিটিশ না থাকলেও, ব্রিটিশসুলভ ভাবনাচিন্তা থাকবে। ফলে শুধু

ঔপনিবেশিক শাসনকে হটালেই হবে না। তার সঙ্গে ঔপনিবেশিক শাসনের হাত ধরে যা কিছু সমাজে গড়ে উঠেছে সেগুলিও বিসর্জন দিতে হবে। গান্ধি মনে করতেন সবাইকে চাষিদের মতো সহজ-সরল জীবনযাপন করতে হবে। এই সরল জীবনযাপনের আদর্শের সঙ্গে খাদির পোশাক ও চরকা কাটার কর্মসূচিও যুক্ত হয়েছিল। যন্ত্র-নির্ভর আধুনিক সভ্যতার প্রতিই গান্ধির বিরোধিতা দেখা যায় হিন্দ স্বরাজ-এর আলোচনায়।

চরকা কাটায় ব্যস্ত মহাত্মা গান্ধি

স্বাভাবিকভাবেই গান্ধির পাশ্চাত্য ও যন্ত্র-নির্ভর-সভ্যতা-বিরোধী বক্তব্য সবাই সমর্থন করেননি। বিশেষত খেয়াল করার মতো বিষয় এই যে, গান্ধি নিজেই তাঁর বক্তব্য প্রচার করার কাজে সংবাদপত্রকে ব্যবহার করেছিলেন। অথচ সংবাদপত্র আধুনিক যন্ত্র-নির্ভর-সভ্যতার একটি প্রধান নমুনা ছিল। পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যাতায়াতের ক্ষেত্রেও গান্ধি রেলব্যবস্থার সুবিধা নিয়েছিলেন।

টুকরো কথা

চরকা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

"....স্বরাজ জিনিসটা কী। আমাদের দেশনায়কেরা স্বরাজের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করেন নি। স্বাধীনতা

শব্দটার মানে বিস্তৃত। নিজের চরকায় নিজের সুতো কাটবার স্বাধীনতা আমাদের আছে। কাটি নে তার কারণ কলের সুতোর সঙ্গে সাধারণত চরকার সুতো পাল্লা রাখতে পারে না। হয়তো পারে, যদি ভারতের বহু কোটি লোক আপন বিনা মূল্যের অবসরকাল সুতো কাটায় নিযুক্ত করে চরকার সুতোর মূল্য কমিয়ে দেয়। এটা.... সম্ভবপর নয়....। ....

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে, দেশে সকলে মিলে চরকা চালালে অর্থকষ্ট কিছু দূর হতে পারে, কিন্তু সেও স্বরাজ নয়।....

.....

চরকা কাটা স্বরাজসাধনার প্রধান অঙ্গ এ কথা যদি সাধারণে স্বীকার করে তবে মানতেই হয়, সাধারণের মতে স্বরাজটা একটা বাহ্য ফললাভ। এইজন্যই দেশের মঙ্গলসাধনে আত্মপ্রভাবের যে-সকল চরিত্রগত ও সামাজিক প্রথাগত বাধা আছে সেই প্রধান বিষয় থেকে আমাদের মনকে সরিয়ে এনে চরকা-চালনার উপরে তাকে অত্যন্ত নিবিষ্ট করলে লোকে বিস্মিত হয় না, বরঞ্চ আরাম পায়।....

.....

স্বরাজকে যদি প্রথমে দীর্ঘকাল কেবল চরকার সুতো আকারেই দেখতে থাকি তা হলে আমাদের সেই দশাই হবে। এই রকম অন্ধ সাধনায় মহাত্মার মতো লোক হয়তো কিছু

দিনের মতো আমাদের দেশের এক দল লোককে প্রবৃত্ত করতেও পারেন, কারণ তাঁর ব্যক্তিগত মাহাত্ম্যের 'পরে তাদের শ্রদ্ধা আছে। এইজন্যে তাঁর আদেশ পালন করাকেই অনেকে ফললাভ বলে গণ্য করে। আমি মনে করি, এ রকম মতি স্বরাজলাভের পক্ষে অনুকূল নয়।....

[উদ্ধৃত অংশটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর 'স্বরাজসাধন' প্রবন্ধের থেকে নেওয়া। (ে-এর ব্যবহার বাদে মূল বানান অপরিবর্তিত)]

বিভিন্ন কর্মসূচির পাশাপাশি গান্ধি নিজের ব্যক্তিত্বকেও একটা ছাঁচে রূপ দেন। হাঁটুর উপরে সাধারণ কাপড় পরা, সরল ভাষায় কথা

বলা শুরু করেন তিনি। তার পাশাপাশি গ্রামজীবনের সঙ্গে জড়িত নানা লোকধর্মের প্রতীক ব্যবহার করতে শুরু করেন গান্ধি। এর ফলে দেশের অসংখ্য সাধারণ মানুষের 'আপনজন' হয়ে ওঠেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি।

কিন্তু, জনপ্রিয় লোকধর্মের অনুষঙ্গ ব্যবহার করার উলটো বিপদও ছিল। তুলসীদাসী রামায়ণ বা রামরাজ্য প্রভৃতি প্রতীক ও ধারণা বাস্তবে উত্তর ও মধ্য ভারতের হিন্দু জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল। কিন্তু, দেশের অনেক সংখ্যক অন্যান্য ধর্মাবলম্বী গোষ্ঠীর কাছে ঐ প্রতীকগুলির গুরুত্ব তেমন ছিল না। বরং হিন্দু

ধর্মীয় প্রতীক ব্যবহারের ফলে, গান্ধির আদর্শের মধ্যে একটা অংশে সর্বজনীনতা নষ্ট হয়েছিল।

টুকরো কথা

গান্ধি ও গুজব

মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে আন্দোলনগুলি সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে গুজবের ও জনশ্রুতির একটা বড়ো ভূমিকা ছিল। বস্তুত, গুজব ও জনশ্রুতি অনেক ক্ষেত্রেই জনগণকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলনে টেনে এনেছিল। অনেক মানুষ বিশ্বাস করতেন গান্ধি একজন ক্ষমতাবান সাধুর মতো।

কৃষকেরা যেমন বিশ্বাস করতেন গান্ধি জমিদারি শোষণকে আটকাবেন। আবার আসামের চা-বাগানের কুলিরা তাদের বাগিচা ছেড়ে চলে এসে দাবি করেন তাঁরা গান্ধির আদেশ মোতাবেক কাজ করেছেন। কোথাও গান্ধি ছিলেন দেবতার মতো। বাংলায়ও উপজাতি সমাজের মানুষেরা মনে করতেন গান্ধির নাম নিলে ব্রিটিশ পুলিশের গুলিও কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই ঐসব আন্দোলনগুলি গান্ধির ঘোষিত মত ও পথের বাইরে এমনকী বিরোধী হয়ে পড়েছিল।

মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে তিনটি আঞ্চলিক আন্দোলন

১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে গান্ধি ভারতবর্ষে ফেরেন। এর পরবর্তী তিন বছরে তিনটি আঞ্চলিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন গান্ধি। অতীতে জাতীয় কংগ্রেস-নেতৃত্ব একটি সর্বভারতীয় কর্মসূচি নিত। তারপর অঞ্চল অনুযায়ী সেই কর্মসূচিগুলিকে বাস্তব রূপ দিত। অন্যদিকে মহাত্মা গান্ধি স্থানীয় তিনটি বিষয় নিয়ে আঞ্চলিক পর্যায়ে আন্দোলন শুরু করেছিলেন। বিহারের চম্পারনে নীল চাষিদের অনেক দিন ধরেই নীলচাষ-বিরোধী ক্ষোভ জমা হয়েছিল। স্থানীয় কিছু ব্যবসায়ী, শিক্ষক প্রভৃতি ব্যক্তিরা চাষিদের বিক্ষোভ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে

শুরু করেন। সেই অর্থে চম্পারনের আন্দোলনে গান্ধির ভূমিকা খানিক সীমিত ছিল। কিন্তু স্থানীয় চাষিদের কাছে গান্ধি ছিলেন রামায়ণের রামের মতো। তাঁরা মনে করতেন গান্ধি এসে যাওয়ার ফলে ঠিকা-চাষিরা আর রাক্ষস কুঠিয়ালদের ভয় করবে না। কিন্তু চম্পারনের আন্দোলন কিছু ক্ষেত্রে অহিংস সত্যাগ্রহের নীতিকে অতিক্রম করে গিয়েছিল। গুজরাটের খেড়া জেলায় গান্ধিপন্থী সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হয়েছিল। সেখানে বাড়তি রাজস্ব কমানোর দাবিতে কৃষকরা এক জোট হন। কিন্তু নামমাত্র রাজস্ব ছাড় দেওয়া হয়েছিল। ফলে খেড়ায় আন্দোলন বিশেষ সফল হয়নি। এরপর গান্ধি আমেদাবাদে মিল মালিক ও শ্রমিকদের সংঘাতের মধ্যে হস্তক্ষেপ

করেন। সেখানে শ্রমিকদের দাবি অনুযায়ী মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনের পক্ষে গান্ধি অনশন শুরু করেন। শেষপর্যন্ত দাবির থেকে কম হলেও শ্রমিকদের মজুরি খানিক বাড়ানো হয়েছিল। এইভাবে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিক পর্যন্ত সর্বভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধির ভূমিকা স্পষ্ট ছিল না। কিন্তু রাওলাট আইন চালু করাকে কেন্দ্র করে গান্ধি সর্বভারতীয় স্তরে আন্দোলনের পরিকল্পনা করেন।

টুকরো কথা

রাওলাট সত্যাগ্রহ ও জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে এস.এ.টি. রাওলাটের নেতৃত্বে একটি কমিটি দুটি বিল

আইনসভায় পেশ করে। ঐ বিলদুটিতে বিপ্লবী আন্দোলন আটকানোর জন্য ব্রিটিশ সরকারের হাতে আরও বেশি দমনমূলক ক্ষমতা দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। ঐ বিল দুটির বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধি সত্যাগ্রহ আন্দোলন করেছিলেন। ঐ বছরই ৬ এপ্রিল সাধারণ ধর্মঘটের মাধ্যমে জাতীয় স্তরের আন্দোলন শুরু হয়। তার তিন দিন পরে গান্ধি জেলে যাওয়ার পর আন্দোলন হিংসামূলক হয়ে ওঠে।

পঞ্জাব প্রদেশে রাওলাট সত্যাগ্রহের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকার চূড়ান্ত দমনমূলক নীতি নিয়েছিল। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ১৩ এপ্রিল অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে অনেক মানুষ নিরস্ত্র প্রতিবাদে শামিল হয়েছিলেন। অথচ সেই নিরস্ত্র

মানুষদের উপর চূড়ান্ত সন্ত্রাস চালায় সেনাবাহিনীর কমান্ডার মাইকেল ও' ডায়ার। জালিয়ানওয়ালাবাগে একটি মাত্র বেরোনোর পথ ছিল। সেই পথটি আটকে রেখে প্রতিবাদী মানুষদের উপর টানা গুলি চালিয়ে যাওয়া হয়। অসংখ্য মানুষ হতাহত হন। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন ভারতবাসীরা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ বর্বর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে স্যর উপাধি ত্যাগ করেছিলেন।

টুকরো কথা

খিলাফৎ আন্দোলন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে গ্রেট ব্রিটেন তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে এই ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। কারণ, তুরস্কের

সুলতান ছিলেন ইসলাম জগতের খলিফা। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে তুরস্কের সুলতানকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তুরস্কের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন মুসলিম লিগের কিছু নেতা খলিফার মর্যাদা ও সম্মান পুনরুদ্ধারের জন্য খিলাফৎ আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে খিলাফৎ কমিটি গড়ে ওঠে। ঐ কমিটির অন্যতম নেতা ছিলেন মহাত্মা গান্ধি।

নিজে করো

তোমার স্থানীয় অঞ্চলে কোনো বয়স্ক মানুষ স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন কি না খোঁজ করো। থাকলে তাঁর/তাঁদের অভিজ্ঞতার একটি সাক্ষাৎকার নাও। পাশাপাশি স্থানীয় অঞ্চলে তোমার বয়সি ছেলেমেয়েরা স্বাধীনতা আন্দোলন বিষয়ে কী কী জানে তার একটা সমীক্ষাপত্র তৈরি করো।

অহিংস অসহযোগ থেকে ভারত ছাড়ো আন্দোলন : মহাত্মা গান্ধির বিক্ষোভ প্রদর্শনের বিবর্তন

রাওলাট সত্যাগ্রহের পরে তিনটি প্রধান জাতীয় আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধি। সেগুলি হলো যথাক্রমে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন ও ভারত ছাড়ো আন্দোলন। অবশ্য অসহযোগ আন্দোলনের আগে খিলাফৎ আন্দোলনে যোগ দেন গান্ধি। সেই আন্দোলনের সূত্রে ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমানদের একজোট করে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্য ছিল গান্ধির।

খিলাফৎ আন্দোলনের রেশ ধরেই ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়। গোড়ার দিকে ছাত্রেরা স্কুল-কলেজ ছেড়ে আন্দোলনে যোগ দেয়। অনেক আইনজীবী আদালত থেকে ও মধ্যবিত্ত মানুষ সরকারি চাকরি থেকে পদত্যাগ করেন। পাশাপাশি জাতীয় বিদ্যালয় তৈরির উদ্যোগও নেওয়া হয়েছিল। ধীরে ধীরে আন্দোলন অহিংস থেকে উগ্র রূপ নিতে থাকে। বিদেশি দ্রব্য বয়কটের পাশাপাশি জনসমক্ষে বিদেশি কাপড় পোড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। অসহযোগ আন্দোলনের হিংস্র চরিত্র দেখে শেষ পর্যন্ত গান্ধি আন্দোলন স্থগিত করে দেন।

টুকরো কথা

চৌরিচৌরার ঘটনা

অসহযোগ আন্দোলন সর্বত্র অহিংস ছিল না। এমনকী গান্ধি চেষ্টা করেও সবসময় জনগণকে সংযত রাখতে পারেননি। হিংসার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছিল উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার চৌরিচৌরা গ্রামে। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ৪ ফেব্রুয়ারি ঐ গ্রামের স্থানীয় মানুষেরা প্রতিবাদ জানাতে সমবেত হন। ক্রমে পুলিশ ও জনতার মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। জনতার তাড়ায় পুলিশেরা থানায় ঢুকে পড়লে থানার দরজা বন্ধ করে বাইরে থেকে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনায় গান্ধি অহিংস অসহযোগ আন্দোলন তুলে নিয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল দেশবাসী

তখনও অহিংস আন্দোলনের জন্য উপযুক্ত হয়ে ওঠেনি। তবে জাতীয় কংগ্রেসের অনেক নেতাই এই সিদ্ধান্তের জন্য গান্ধির সমালোচনা করেছিলেন।

তবে অসহযোগ আন্দোলনের ফলে ভারতে কাপড় আমদানির হার অনেকটাই কমে গিয়েছিল। পাশাপাশি শ্রমিক ও কৃষকেরা অনেকেই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। যদিও শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষেরা গণহারে আন্দোলনে যোগ দেননি। তাছাড়া খিলাফৎ আন্দোলন ধীরে ধীরে থেমে গিয়েছিল। জাতীয় বিদ্যালয় ও দেশীয় কাপড়ের জনপ্রিয়তাও ক্রমে কমেছিল। অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ভারতবর্ষের সবজায়গায় ছড়িয়ে পড়েনি। পাশাপাশি এক একটি অঞ্চলে

মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে ভারতবাসী। মূল ছবিটি চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য-র আঁকা (১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ)।

এক একভাবে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সেইসব মানুষেরা অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন যাঁরা আগে কংগ্রেস-পরিচালিত আন্দোলনগুলিতে শামিল হননি। ছাত্র-যুব সমাজ ও নারীরাও অসহযোগ আন্দোলনে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

অহিংস আন্দোলনের পর বেশ কিছু বছর নতুন গণআন্দোলন গড়ে তোলার পরিস্থিতি ছিল না। গান্ধি নিজে বেশ কয়েকবছর জেলে ছিলেন।

তাছাড়া জেল থেকে বেরিয়েও তিনি আদর্শ সত্যাগ্রহী কর্মী তৈরিতে মনোযোগ দিয়েছিলেন। অন্যদিকে কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যেও নতুন বিবাদ তৈরি হয়েছিল। কংগ্রেসের মধ্যে স্বরাজ্যপন্থী বলে একটি নতুন গোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল।

চিত্তরঞ্জন দাশ

টুকরো কথা

স্বরাজ্য দল

কংগ্রেসের মধ্যে চিত্তরঞ্জন দাশ ও মোতিলাল নেহরু প্রমুখ নেতারা গান্ধির পন্থা থেকে বেরিয়ে আসার কথা বলেছিলেন। তাঁদের মতে সরকারি আইন পরিষদকে বয়কট না করে তাতে অংশ নেওয়া উচিত। সেভাবে সরকারি নীতি ও

কাজে বাধা দেওয়া যাবে। অন্যদিকে গান্ধিপন্থীরা পুরোনো রাস্তাতেই চলতে উৎসাহী ছিলেন। ফলে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের শেষে দিকে চিত্তরঞ্জন দাশ ও মোতিলাল নেহরু মিলে কংগ্রেস-খিলাফৎ স্বরাজ্য দল তৈরি করেন। ঐ দলটি কংগ্রেসের মধ্যেই একটি গোষ্ঠী হিসেবে কাজ করতে থাকে। কিন্তু আলাদা কর্মসূচি নিলেও গান্ধির পরামর্শ মতো দুই গোষ্ঠীই কংগ্রেসের মধ্যে থেকে গিয়েছিল। চিত্তরঞ্জন দাশ মারা যাওয়ার পর (১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ) গোষ্ঠীগুলি এক হয়ে যায়।

মোতিলাল নেহরু